# আন্ডারগ্রাউন্ড মিডিয়া এবং ডিএফপি
# বছরে সরকারের ক্ষতি ২০ কোটি টাকা

**সুমিত হক**

প্রতিদিন পত্রিকা বের হয় ৫০ থেকে ৬০ কপি। স্টাফ সংখ্যা ৫ থেকে ৭ জন। দিনের আলোয় সাধারণ মানুষ এর মুখ দেখে না। এগুলোর অস্তিত্ব বাজারে না থাকলেও এগুলো পাওয়া যায় মূলত, দুই-তিনটি সরকারি দপ্তরে। আর এসব পত্রিকার আয় চমকে ওঠার মতো। মাসে সর্বনিম্ন ৯০ হাজার টাকা। এগুলোর সাধারণ নাম আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা। ঢাকায় বর্তমানে এই আন্ডারগ্রাউন্ডওয়ালাদের দৌরাত্ম্য ভয়াবহ। আশ্চর্য হলেও সত্য, সংবাদপত্র জগতে বিষফোঁড়া হিসেবে আবির্ভূত হওয়া এসব পত্রিকার নেপথ্যের গডফাদার সরকারি প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। এই প্রতিষ্ঠানের অবৈধ পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই একের পর এক আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা বের হচ্ছে। আর কাঁচা টাকার লোভে এখানেও প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য, গ্রুপিং চলছে ধারাবাহিকভাবে। জানা গেছে, বর্তমানে সরকার দলীয় এক এমপি'র নেতৃত্বাধীন একটি গ্রুপ এবং ছাত্রদলের পরিচয়ে জনৈক শফিকের নামে গড়ে ওঠা অপর একটি গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার বিজ্ঞাপন সিন্ডিকেট। বর্তমানে এ দু'টি গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ গ্রুপিং চলছে বলেও সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

দৈনিক, সাপ্তাহিক এসব পত্রিকার আছে বাহারি নাম। যেমন, দৈনিক বঙ্গজননী, দৈনিক নয়া জামানা, দৈনিক সত্যাচার, আজকের প্রত্যাশা, আজকের জীবন, নব সূর্যোদয়, কিষান, নওরোজ, ভোরের কণ্ঠ, বিরল, খোলা কাগজ, গণমুক্তি, সবুজ নিশান, প্রথম প্রহর, জনপদ, অজানা, ভোরের আকাশ, প্রথম সূর্যোদয়, অপরাধ কণ্ঠ, ইনসানিয়াত, নবকণ্ঠ, ইশতেখলাল, আজকের পদ্ম, খোলা বাজার, আজকের অমৃত বাজার, ঢাকার ডাক, একুশে সংবাদ, প্রথম কাগজ, সত্যের আলো, সোনার আলো প্রভৃতি।

**আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার সংখ্যা ও আয়**

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে মিডিয়াভুক্ত পত্রিকার মোট সংখ্যা ৭৫০টি। বর্তমানে ঢাকা থেকে মোট দৈনিক পত্রিকা বের হয় ১৭৮টি। এর মধ্যে প্রায় ১৫০টি আন্ডারগ্রাউন্ড। মূলত, ঢাকার পুরনা পল্টন এবং পুরনো ঢাকার কয়েকটি এলাকা থেকে বের হয় এসব পত্রিকা। এ ছাড়া বাড্ডা, মিরপুর এলাকা থেকেও কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা বের হয়। ডিএফপি সূত্র জানায়, প্রায় পুঁজি ও শ্রম ছাড়া এই ব্যবসা খুবই লাভজনক হওয়ার কারণে গত কয়েক বছরে এর প্রসার ঘটেছে ব্যাপক হারে। ২০০১ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ১১৯টি। গত তিন বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৭৮টি। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত সময়ে সর্বশেষ ২১টি পত্রিকা নতুন প্রকাশিত ও মিডিয়াভুক্ত হয়েছে বলে সূত্র জানায়। সূত্র হিসাব দিয়ে দেখায়, এ ধরনের একটি পত্রিকা দিনে ডিএফপি থেকে কমপক্ষে ৩০ ইঞ্চি পরিমাণ বিজ্ঞাপন পায়। ডিএফপি'র নীতিমালা অনুযায়ী সর্বনিম্ন রেট প্রতি ইঞ্চি ১০৪ টাকা হিসেবে প্রতিদিন ৩ হাজার ১২০ টাকা আসে এই বিজ্ঞাপন থেকে। এই হিসাবে মাসে শুধু ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন থেকে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার মাসে আয় ৯৩ হাজার ৬০০। এ ছাড়া অর্থঋণ আদালত, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, রাজউক, ডেসা প্রভৃতি সরকারি সংস্থা থেকেও মাসে উল্লেখযোগ্য হারে বিজ্ঞাপন পায় এ সব পত্রিকাগুলো। এর পরিমাণও মাসে ৫০ হাজার টাকার নিচে নয়। যেহেতু পত্রিকা প্রকাশনার খরচ একবারে নেই বললেই চলে, সে কারণে এসব পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ের পুরোটাই লাভ। দেখা যায় বছরে সর্বনিম্ন হিসাবেই শুধু ঢাকার ১৫০টি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাবদ ডিএফপি থেকে পরিশোধ করা হয় ১ কোটি ৪০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। বছরে পরিশোধ করা হয় ১৬ কোটি ৮৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এই পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকের চেয়ে অনেক বেশি। দেখা যায় প্রথম শ্রেণীর ২০টি জাতীয় দৈনিকে গড়ে ৫০ ইঞ্চি করে বিজ্ঞাপন দেয়া হলে মাসে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা প্রতি ইঞ্চি হিসেবে এই বিজ্ঞাপন বাবদ মোট পরিশোধ করতে হয় মাসে ৯০ লাখ টাকা। বছরে পরিশোধ করা হয় ১০ কোটি ৮০ লাখ টাকা। অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোকে প্রায় ৬ কোটি টাকার বেশি বিজ্ঞাপন দেয়া হয় ডিএফপি থেকে। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন বরাদ্দের চিত্র দেখলে রীতিমতো শিউরে উঠতে হয়। ডিসেম্বর মাসে ডিএফপি'র এক কর্মকর্তার আন্ডারগ্রাউন্ড সিন্ডিকেট হিসেবে খ্যাত শুধু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে ২২ হাজার ৮১৯ ইঞ্চি সরকারি বিজ্ঞাপন এবং ৪ হাজার ৯৩৩ ইঞ্চি আধা সরকারি বিজ্ঞাপন, সব মিলিয়ে ২৭ হাজার ৭৪৩ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন। জানুয়ারি মাসে এই ২৩টি পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেয়েছে ২০ হাজার ৫৬৪ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন এবং ৬ হাজার ২৯১ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন, মোট ২৬ হাজার ৮৫৫ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন। দুই মাসে মোট বিজ্ঞাপন পেয়েছে ৫৪ হাজার ৫৯৮। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন এই ২৩ টি পত্রিকার প্রতিটি বিজ্ঞাপন পেয়েছে ৩৯ দশমিক ৫৬ ইঞ্চি। যেসব পত্রিকা এই হারে বিজ্ঞাপন পেয়েছে সেগুলোর নাম সম্ভবত বাংলাদেশের শতকরা ১ ভাগ পাঠকও জানেন না। এগুলোর নাম হচ্ছে, দৈনিক আজকের প্রত্যাশা, স্বাধীন বাংলা, দৈনিক পত্রিকা, আগকের জীবন, বার্তা স্মরণী, বর্তমান কথা, খোলা বাজার, সত্যাচার, সমাচার, রূপবাণী, বাংলাদেশ প্রতিদিন, বঙ্গজননী, প্রথম বেলা, নয়া জামানা, নতুন আলো, নব অভিযান, জনতার মঞ্চ, ঘোষণা, দৈনিক দেশ বাংলা, গণমুক্তি, কিষাণ, ইত্তেসাল, আমল ও আজকের জীবন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সরকারি সংকীর্ণতা, রোষানল আর ডিএফপি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দু'নম্বরির কারণে অনেক প্রতিষ্ঠিত দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও এই হারে বিজ্ঞাপন যায় না। উপরের এই পত্রিকাগুলো দিনে গড়ে প্রায় ২০টি করে বিজ্ঞাপন পেলেও গত ১৫ ফেব্রুয়ারি

সংসদের প্রশ্নোত্তরপর্বে তথ্যমন্ত্রীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের শীর্ষ স্থানীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে দৈনিক প্রথম আলো ২০০৩-০৪ অর্থবছরে পেয়েছে মোট ৫১০টি বিজ্ঞাপন এবং দৈনিক যুগান্তর পেয়েছে ১ হাজার ১৬৬টি বিজ্ঞাপন। দেখা যায়, প্রথম আলো গড়ে দিনে একটি এবং যুগান্তর দিনে তিনটি করে বিজ্ঞাপন পেয়েছে। এছাড়া এ বছরে দৈনিক জনকণ্ঠ কোনো সরকারি বিজ্ঞাপন পায়নি! অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিজ্ঞাপন পাওয়া সরকারের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত দিনকাল, ইনকিলাব ও জামাতের দলীয় পত্রিকা সংগ্রাম ছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোই অধিকাংশ সরকারি বিজ্ঞাপন দখল করে রেখেছে।

এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেয়া নিয়েও অদ্ভুত কিছু পদ্ধতির কথা জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অর্থঋণ আদালত, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, রাজউক, ডেসাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অসংখ্য বিজ্ঞাপন এসব পত্রিকায় ছাপা হয় বিভিন্ন কায়দায়। যেমন, অর্থঋণ আদালতে বিচারক যে রায় বা নির্দেশ দেন তাতেই উল্লেখ থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোর পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি সব সময় এই আদালতের সামনে উপস্থিত থাকে। আদালত কোনো রায় বা নির্দেশ দেয়ার পর এ নির্দেশ লেখে আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা। এই কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমেই আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার প্রতিনিধিরা বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট পত্রিকার নাম লেখার অংশে বসিয়ে নেয় বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার নাম। কর্মচারীরা এত সুকৌশলে কাজটি করে যে বিচারক বা উর্ধ্বতন কর্তা-ব্যক্তিদের কেউই বিষয়টি জানার সুযোগই পান না। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো তখন বাধ্য হয় এসব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে। এ ব্যাপারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একজন একজন কর্মকর্তা বলেন, 'প্রথমে বুঝতাম না, কেন বার বার নাম না জানা সব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার নির্দেশ আসছে। অনেক পরে বিষয়টি আমার পরিচিত ডিএফপি'র একজন কর্মকর্তার মাধ্যমেই জানতে পারি। এ ব্যাপারে ডিএফপি'র এক কর্মচারী জানায়, 'বিচারক তার রায়ে সরাসরি কোনো পত্রিকার নাম প্রকৃতপক্ষে উল্লেখ করেন না। রায়ের মাঝখানে পত্রিকার নামগুলো বসিয়ে দেয় আদালতের কর্মচারীরা।' ডিএফপি সূত্র জানায়, সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন আসে অন্যভাবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয় বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকায়। এ ব্যাপারে একটি সূত্র জানায়, সিটি কর্পোরেশন, রেল ভবন, সড়ক ও জনপথ, রাজউক, ওয়াসাসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু দরপত্র প্রক্রিয়া গোপনে সম্পন্ন করা হয়। বিশেষত, টেন্ডারকে ঘিরে থাকে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী, অন্যান্য কর্মকর্তাসহ বিশেষ সিন্ডিকেট। অবৈধ সুবিধা গ্রহণের জন্য যেসব টেন্ডার প্রক্রিয়া গোপনে সম্পন্ন করতে চায় তারাই বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেয় আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোতে। সূত্র জানায়, গোপনে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার অন্য পদ্ধতিও আছে। এই পদ্ধতিও সম্পন্ন করা হয় ডিএফপি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে। সূত্র উদাহরণ দিয়ে জানায়, ধরা যাক, দরপত্র আহবানের একটি বিজ্ঞাপন দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা থেকে। কিন্তু কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো সুবিধাবাদী চক্র এই বিজ্ঞাপন আড়াল করতে চায়। সেক্ষেত্রে ডিএফপি'র দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা সরকারি আদেশ সত্বেও বিজ্ঞাপনটি প্রথম আলোতে পাঠায় না। তারা বাজার থেকে নির্দিষ্ট তারিখের একটি প্রথম আলো কিনে ভেতরের কোনো পাতায় বিজ্ঞাপনটি পেস্ট করে ওই পাতা আবার নতুন করে ছাপায়। এভাবে ছাপানো কয়েক কপি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোতে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে সহায়তা নেয়া হয় আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার প্রেসের। সূত্র জানায়, পুরানা পল্টন লাইনের একটি বহুতল ভবনে আধুনিক মানের একটি প্রেস চার-পাঁচ বছর আগে বসানো হয়েছে। প্রেসটি কেনা হয়েছে কয়েকটি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার মালিকের যৌথ উদ্যোগে। এই প্রেস থেকেই পত্রিকার পাতা নতুন করে ছাপানোর কাজ করা হয়। এভাবে বছরে অসংখ্য সরকারি টেন্ডার আড়াল করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে এক দিকে সুবিধাবাদী চক্র নিজেদের সুবিধামত রেটে সরকারি কাজ করার সুযোগ নিচ্ছে। অন্যদিকে, ডিএফপি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এর মাধ্যমে আয় করছে মোটা অঙ্কের অবৈধ অর্থ। অপচয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অর্থের। সূত্র আরো জানায়, পুরানা পল্টনের ওই বহুতল ভবন থেকেই একসঙ্গে প্রায় ৮০টি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা ছাপা হয়। শুধু লোগো ছাড়া এই পত্রিকার আর সবকিছুই একই রকম থাকে।

**ফিরোজা নিজস্ব সিন্ডিকেটকে ডিসেম্বর '০৪ ও জানুয়ারি '০৫ মাসে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন বিতরণী**

| পত্রিকার নাম | ডিসেম্বর '০৪-জানুয়ারি '০৫ | | |
|---|---|---|---|
| | সরকারি | আধাসরকারি | মোট |
| আজকের প্রত্যাশা | ২৪৫১-২০৬৫ | ৩৮২ - ৮৬১ | ২৮৩৩ - ২৯২৬ |
| পত্রিকা | ১২২০ - ৯৭৬ | ১৩৩ - ৩৪ | ১৩৫৩ - ১০১০ |
| আজকের জীবন | ১৪৩৭-১১০৩ | ৬২৫ - ১৬৬৩ | ২০৬২ - ২৭৬৬ |
| আমল | ৯১০ - ৮৩৮ | ৬৩ - ১৯৫ | ৯৭৩ - ১০৩৩ |
| ইত্তেসাল | ১০২৩ - ৯৪১ | ২৫৯ - ২৯২ | ১২৮২ - ১২৩২ |
| কিষাণ | ৮৬৩ - ৮১২ | ৬৫১ - ৩৪১ | ১৫১৪ - ১১৫৩ |
| গণমুক্তি | ৮২৭ - ৬৪১ | ২৫৩ - ১৮ | ১০৮০ - ৬৫৯ |
| ঘোষণা | ১০৭৬ - ৯৯৯ | ৪২০ - ৬৫৬ | ১৪৯৬ - ১৬৫৫ |
| জনতার মঞ্চ | ৮১২ - ৭৬১ | ৬৮ - ৭১ | ৮৮০ - ৮৩২ |
| নব অভিযান | ৭০০ - ৬৫৫ | ৩৮৬ - ২৭৯ | ১০৮৬ - ৯৩৪ |
| নতুন আলো | ৫৫৩ - ৬৬৩ | ৩১৮ - ৪০৩ | ৮৭১ - ১১৬৬ |
| নয়াজামানা | ৮৬৮ - ৫৩৯ | ১৮৭ - ২৮২ | ১০৫৫ - ৮২১ |
| দেশ জামানা | ১১৪৫ - | ০ | ১১৪৫ - |
| প্রথম বেলা | ৮১৩ - ৭৭৬ | ০ - ৭৬ | ৮১৩ - ৮৫২ |
| বঙ্গজননী | ৬৩৯ - ৭০৭ | ১৮৮ - ৩৬৮ | ৮২৭ - ১০৯৫ |
| রূপবাণী | ১১২৯ - ৯৪৩ | ২৩৯ - ৭৮ | ১৩৬৮ - ১০২১ |
| সমাচার | ১২০৪-১২৭৮ | ২২২ - ৮৬ | ১৪২৬ - ১৩৬৪ |
| সত্যাচার | ৭৭০ - ৪১৩ | ০ - ০ | ৭৭০ - ৪১৩ |
| খোলাবাজার | ৮০১ - ৭৭২ | ২২৪ - ২০০ | ১০২৫ - ৯৭২ |
| বর্তমান কথা | ৯৫৪ - ৯৩১ | ১৪ - ৪৫ | ৯৬৮ - ৯৭৬ |
| বাংলাদেশ প্রতিদিন | ৮৮৪ - ৮২৫ | ৬৬ - ২৫৩ | ৯৫০ - ৮৫৪ |
| স্বাধীন বাংলা | ৮৭৬ - ৯৯৬ | ২১ - ২৯ | ৮৯৭ - ১০৫৭ |
| বার্তাস্মরণী | ৭৫১ - ৭৮৫ | ১৪৪ - ৬১ | ৮৯৫ - ১০৩৫ |
| দেশ বাংলা | - ১১৪৫ | - ০ | - ১১৪৫ |

**কারা মালিক এসব পত্রিকার?**

ডিএফপি কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এসব পত্রিকার মালিক মূলত, বিভিন্ন সময়ে সরকারি দল থেকে সুবিধা নেওয়া একটি ধান্দাবাজ চক্র। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিএফপি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, প্রেস ব্যবসায়ী, এমনকি সরকারি দলের সংসদ সদস্যও রয়েছেন এই তালিকায়। একটি সূত্র জানায়, আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোর ত্রাণকর্তা হিসেবে জোট সরকারের আমলে আবির্ভূত হয়েছেন ঢাকার একটি আসন থেকে নির্বাচিত সরকারি দলের এক এমপি। তিনি নিজে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার মালিক। এর আগে একাধিকবার আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকারের ভেতর থেকে নেয়া উদ্যোগে বাধা দিয়েছেন বলেও শোনা যায়। সূত্র জানায়, যে কেউ আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা সহজে বের করতে পারে ডিএফপি'র কর্মকর্তাদের সহায়তায়, মিডিয়াভুক্তও হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কর্মকর্তাদের অনেকেই বেনামিতে একাধিক আন্ডারগ্রাউন্ড দৈনিক-সাপ্তাহিক বের করেছেন বলে জানা যায়। পত্রিকা বের করার ক্ষেত্রে নাম, ডিক্লারেশন, মিডিয়াভুক্তি এসব নিয়ে কোনো ঝামেলাই পোহাতে হয় না তাদের।। এ কাজে এদের ক্ষমতা প্রচন্ড।

সূত্র জানায়, ডিএফপি'র অধিকাংশ কর্মকর্তা কোনো না কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কেউ বেনামিতে সরাসরি মালিক, আবার

কেউ অংশীদারের ভিত্তিতে যুক্ত। এর কারণ, যারা আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা বের করতে চায় তারা ডিক্লারেশন পাওয়ার সুবিধার জন্য ডিএফপি'র কর্মকর্ত-কর্মচারী, বিশেষত কর্মকর্তাদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যুক্ত করে। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী চুক্তিতে এসব পত্রিকায় কাজও করছেন।

এসব পত্রিকার মালিকদের তালিকায় আরো আছেন বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের বিজ্ঞাপন ম্যানেজাররা। বেনামিতে এসব পত্রিকা খুলে তারা রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডিএফপি সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, একটি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার ম্যানেজারের আছে তিনটি পত্রিকা। একই সংখ্যক পত্রিকার মালিক মৌলবাদীদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত অপর একটি জাতীয় দৈনিকের বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকগুলোর একটি এবং ১৯৯৮ সাল থেকে প্রচার সংখ্যার দৌড়ে অনেক পিছিয়ে পড়া একটি দৈনিকের বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের আছে ২টি পত্রিকা। তোপখানা রোড থেকে প্রকাশিত অর্ধ-আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা হিসেবে পরিচিত একটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের আছে ২টি পত্রিকা। এই বিজ্ঞাপন ম্যানেজাররা অত্যন্ত প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত ডিএফপিতে। বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থার জনসংযোগ কর্মকর্তারাও জড়িত এসব পত্রিকার সঙ্গে। সূত্র জানায়, সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ শাখার এক পদস্থ কর্মকর্তা ডিএফপি'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত। এর মাধ্যমে তিনি এসব পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তারা যুক্ত আছেন আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার সঙ্গে। তথ্য অধিদপ্তরের দু-একজন কর্মকর্তা এমনকি একজন কর্মচারীও সম্পৃক্ত আছেন এর সঙ্গে। এর বাইরে কিছু ফটকাবাজ ব্যবসায়ীও অন্য ব্যবসার পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন এই লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসায়ীদের অনেকেই আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার ব্যবসার মাধ্যমে প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে বিপুল অঙ্কের টাকার মালিক হয়েছেন। রীতিমত গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছেন। এমন কয়েকজন পত্রিকা খুলে বসে আছেন পুরানা পল্টন, মতিঝিল, সায়েদাবাদ, ফকিরাপুল প্রভৃতি এলাকায়।

**আন্ডারগ্রাউন্ড মিডিয়া সিন্ডিকেট কাহিনী**

ডিএফপি'র বিজ্ঞাপনকে ঘিরে আছে প্রভাবশালী চক্রের সিন্ডিকেট। বর্তমানে সরকার সমর্থক দু'টি গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে ডিএফপি'র সিন্ডিকেট। একটি গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন ঢাকা-৪ থেকে নির্বাচিত সরকারদলীয় সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। দৈনিক দেশ জনতা নামে তার নিজের একটি পত্রিকা আছে। তার সিন্ডিকেটে আছে প্রায় ৮০টি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও ছাত্রদলের পরিচয়ে দৈনিক আজকের জীবন নামে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার কর্ণধার শফিকের নেতৃত্বে আছে আর একটি গ্রুপ। তার সিন্ডিকেটে আছে প্রায় ৫০টি পত্রিকা। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় দৈনিক ব্যানার নামে একটি পত্রিকার মালিক জালাল তৎকালীন দু'জন প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করত এককভাবে। ২০০১ সালের নির্বাচনের এক মাসের মাথায় এই নিয়ন্ত্রণ চলে যায় সালাহউদ্দিন আহমেদ এমপি'র হাতে। ২০০৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আজকের জীবনের শফিকের। এ সময় সালাহউদ্দিন আহমেদ এম পি তার নেতৃত্বাধীন সংগঠন বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ থেকে বহিষ্কার করেন শফিককে। এরপর শফিকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আর একটি গ্রুপ। এই গ্রুপটি ডিএফপি'তে নতুন গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। এদর সংগঠনের নাম পিএনএস। সূত্র জানায়, সালাহউদ্দিন আহমেদ এমপি নেপথ্যে থেকেই করছেন সবকিছু, তার গ্রুপে সামনে থেকে নিতৃত্ব দিচ্ছে আজকের প্রত্যাশা নামে একটি পত্রিকার কর্ণধার আবুল হোসেন। জানা যায়, আজকের জীবন, আজকের প্রত্যাশা দুটো পত্রিকার নাম সাধারণ মানুষ না জানলেও বিজ্ঞাপনপ্রাপ্তির দিক থেকে এ দু'টিই শীর্ষে। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে আজকের প্রত্যাশা পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেয়েছে ২ হাজার ৮৩৩ ইঞ্চি এবং ২ হাজার ৯২৬ ইঞ্চি। আজকের জীবন পত্রিকা এই দুই মাসে বিজ্ঞাপন পেয়েছে ২ হাজার ৬২ ইঞ্চি এবং ২ হাজার ৭৬৬ ইঞ্চি। অর্থাৎ আজকের প্রত্যাশা গড়ে প্রতিদিন ৯৬ ইঞ্চি এবং আজকের জীবন ৮১ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন পেয়েছে। অথচ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এ দু'টি পত্রিকার এক ইঞ্চি বিজ্ঞাপনও পাওয়ার কথা নয়। কারণ নীতিমালায় স্পষ্ট বলা আছে কমপক্ষে ৬ হাজার প্রচার সংখ্যা না হলে ঢাকায় প্রকাশিত দৈনিকে কোনো বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এ দু'টি পত্রিকার সার্কুলেশন বা প্রচার সংখ্যা একবারেই নেই। দিনে বড় জোর ১০০-২০০ কপি প্রকাশ করা হয় শুধু সরকারি দপ্তরগুলোতে বিতরণের জন্য। সূত্র জানায়, দুই গ্রুপের চাপে ডিএফপি'র নীতিমালা কোথাও পালন করা হয় না। নিয়মিত টু পাইসের কারণে ডিএফপি'র কর্মকর্তারাও এ নিয়ে কোনো অভিযোগ করে না। বরং তারা চান এই সিন্ডিকেট কালচার বহাল থাকুক। তাহলে নিরাপদে তাদের টু পাইস কামানো সম্ভব হয়। জানা গেছে, সিলেট থেকে নির্বাচিত বিএনপি'র এমপি, যিনি তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ক্ষেত্রেও প্রভাবশালী তিনি সম্প্রতি একটি দৈনিক বের করেছেন বেনামীতে। নাম স্বাধীন বাংলা। দেখা যায় তার প্রভাবের কারণে এই পত্রিকা গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে বিজ্ঞাপন পেয়েছে যথাক্রমে ৮৭৬ এবং ৯৯৬ ইঞ্চি। এই সিন্ডিকেট প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করলে সালাহউদ্দিন আহমেদ এমপি বলেন, 'আমার এমন কোন প্রয়োজন নেই যে ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শফিক নামে এক ছেলে ছাত্রদলের নাম ভাঙ্গিয়ে নানা ধরনের অবৈধ কার্যক্রম শুরু করেছিল। আমি তথ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এখন সেই আমার নামে নানা অপপ্রচার করছে। এ ধরনের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ সিন্ডিকেটের সঙ্গে আমার আগেও যোগাযোগ ছিল না, এখনো নেই।' এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য আজকের জীবনের শফিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তার পত্রিকার ঠিকানা বা ফোন নম্বর জানাতে পারেনি কেউ। এমনকি ডিএফপিতেও তার পত্রিকার একটি কপি কেউ দিতে পারেনি।

**দুর্নীতি দমন কমিশনে সম্প্রতি একটি অভিযোগ প্রসঙ্গ**

সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশনে জমা পড়া একটি অভিযোগ থেকে জানা যায়, এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে মূলত ডিএফপি'র কর্মকর্তারাই। অভিযোগে বলা হয়, বর্তমান সহকারী পরিচালক (এবিসি ও বিজ্ঞাপন) ফিরোজা খাতুন ১৯৮৫ সাল থেকে ডিএফপি'তে এবিসি শাখায় কর্মরত। সম্প্রতি বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে তাকে বিজ্ঞাপন শাখারও অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি এবিসি শাখার দায়িত্ব নেয়ার আগে মিডিয়াভুক্ত পত্রিকার সংখ্যা ছিল ২২৭টি। তার দায়িত্ব পালন সময়ে এখন পর্যন্ত মিডিয়াভুক্ত পত্রিকার সংখ্য ৭৫০। অর্থাৎ ৫২৩টি পত্রিকা মিডিয়াভুক্ত হয়েছে তার দায়িত্বে। এর মধ্যে ৫০-৬০টি ছাড়া সবগুলোই মোটামুটিভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড। অর্থাৎ প্রায় ৪৫০টি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা মিডিয়াভুক্ত হয়েছে তার মাধ্যমে। নিজে নেপথ্যে থেকে নিকটাত্মীয়দের নামে পত্রিকা বের করেছেন ২টি। তার আশীর্বাদ পেলে যে কেউই যে কোনো সময় একটি পত্রিকার ডিক্লারেশন থেকে শুরু করে মিডিয়াভুক্ত হতে পারে। এ কারণে তিনি ডিএফপি'তে পরিচিত আন্ডারগ্রাউন্ড গডমাদার হিসেবে। অভিযোগে আরো বলা হয়, গত ডিসেম্বর মাসে সংসদীয় কমিটির কাছে ফিরোজা খাতুনের দেয়া বিজ্ঞাপন বন্টন প্রতিবেদনে ঘাপলা থাকার কারণে কমিটি তা ফেরত পাঠায়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ফিরোজা খাতুনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ডিএফপি সূত্র জানায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, অভিযোগের প্রমাণও পাওয়া গেছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মহাপরিচালকের সঙ্গে সখ্য ছাড়াও তার অবৈধ আন্ডারগ্রাউন্ড কানেকশনের কারণেই তিনি বারবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকছেন বলে ডিএফপি'র অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ধারণা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, দুর্নীতি দমন কমিশনে জমা দেয়া অভিযোগের কপির ওপর ঢাকার মেয়র, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সুপারিশ, স্বাক্ষর ও সিল রয়েছে। একজন সহকারী পরিচালক মর্যাদার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিন মন্ত্রীর সুপারিশের বিষয়টি চমকপ্রদ। সত্যিই সুপারিশ করেছেন কি'না জানতে চাইলে মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বলেন, 'প্রতিদিন অসংখ্য ফাইল, সুপারিশে স্বাক্ষর করছি। এর মাঝে নির্দিষ্ট কোনো সুপারিশের বিষয় মনে রাখা সম্ভব নয়। এটা ফলসও হতে পারে, আবার ঠিকও হতে পারে। অভিযোগপত্রে অভিযোগকর্তা

হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে ২৭, মিন্টু রোডের জনৈক মোশাররফ হোসেনের। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত ফিরোজা খাতুন বলেন, 'আমার এক উপরস্থ কর্মকর্তা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমি এই বিজ্ঞাপনের দায়িত্বে এসেছি মাত্র দু'মাস আগে। এর আগে প্রায় চার বছর যাবৎ এই বিজ্ঞাপন এর দায়িত্ব পালন করছেন আমার ওই উপরস্থ কর্মকর্তা। আমি আসার পর বিজ্ঞাপন বন্টন নিয়ে নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কারণেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নানা জায়গায় অভিযোগ করে বেড়াচ্ছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও ঠিক নয়। আমি সুষ্ঠু তদন্ত চাই। ডিএফপি নিয়ে ভালো একটা তদন্ত হওয়া উচিত। তাহলে অনেক অজানা তথ্য বের হয়ে আসবে, দিনের পর দিন যারা দুর্নীতি করছে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হবে।' তবে তিনি তার উপরস্থ কর্মকর্তার নাম বলেননি। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে তার সঙ্গে বিরোধ চলছে বিজ্ঞাপন শাখারই উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেনের। আলাপকালে দু'জন কর্মকর্তা জানালেন, এই জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধেও রয়েছে নানা অভিযোগ। তবে প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করছে না। জাহাঙ্গীর হোসেনের সঙ্গে আলাপ করার জন্য তার কক্ষে দিনের বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার গিয়ে এবং টেলিফোনে তার অফিস এবং বাসায় যোগাযোগ করে একবারও তাকে পাওয়া যায়নি। সূত্র আরো জানায়, দুর্নীতি দমন কমিশনে ওই অভিযোগ দেয়াকে কেন্দ্র করে বর্তমানে ডিএফপি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও চলছে প্রচন্ড গ্রুপিং। এ ব্যাপারে মহাপরিচালক খোরশেদ আলমের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে তার পক্ষ থেকে আলাপ করেন উপ-পরিচালক (প্রশাসন) এনামুল কবীর। তিনি বলেন, 'কিছু উৎসাহী ব্যক্তির কারণে দুর্নীতি দমন কমিশনে ওই অভিযোগ দেয়া হয়েছে। এর কোনো সত্যতা নেই। মন্ত্রীদের যে স্বাক্ষর আছে তাও জাল হতে পারে।' প্রসঙ্গত, ২০০৪-এর মাঝামাঝি সময়ে ডিএফপি'র নানা-দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে দুর্নীতির অসংখ্য তথ্য। ২০০৩-এর বিজয় দিবসে পত্রিকায় সরকারি ক্রোড়পত্র প্রকাশ নিয়ে ৭৮ লাখ টাকার দুর্নীতি, বছরে বিজ্ঞাপন বাবদ ৪ কোটি টাকা অপচয়, বিজ্ঞাপন আড়াল করা, যথাযথভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া প্রভৃতি দুর্নীতির তথ্য বেরিয়ে আসে। আর এ জন্য ডিএফপি'র পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষণ) তছির আহমেদ এবং সহকারী পরিচালক (বিজ্ঞাপন) আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে দায়ী করা হয়। পরে তছির আহমেদকে ওএসডি এবং আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে কিশোরগঞ্জে বদলি করা হয় বলে সূত্র জানায়। সূত্র আরো জানায়, সঠিক তদন্ত হলে প্রমাণ হবে ডিএফপি'র হাতে গোনা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই মহা দু নম্বর। কথায় আছে ডিএফপি'র ইট-কাঠ-পাথরও ঘুষ খায়। আসলে ডিএফপি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। সরকারের বিপুল পমিাণ অর্থ অপচয় বন্ধের জন্যই এ তদন্ত প্রয়োজন।

**আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কের রকমফের ও দাপট**

একবার ঢাকার এক পরিচিত সাংবাদিকের আত্মীয় আর এক সাংবাদিকের হুমকির শিকার হলেন। আসাদগেট এলাকায় পরিচিত সাংবাদিকের আত্মীয়ের থেমে থাকা গাড়িতে এসে ধাক্কা দেয় অপর একটি মোটরসাইকেল। এই মোটরসাইকেলটি ছিল একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার এক মালিকের। নিজের ভুলে দুর্ঘটনা ঘটলেও এই তথাকথিত মালিক-সম্পাদক ওই গাড়ির মালিককে খুঁজে বের করে এবং ফোনে এক লাখ টাকা দাবি করে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বাবদ। হুমকি দেয় তিন দিনের মধ্যে টাকা না দিলে মামলা হবে, পুলিশ যাবে বাসায়। এ ধরনের হুমকিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই গাড়ির মালিক। দুর্ঘটনার জন্য দায়ীও নন তিনি, আবার এমন কোনো বড় ঘটনাও ঘটেনি, কেউ আহতও হয়নি, বরং তার গাড়িরই ক্ষতি হয়েছে, পেছনের একটি লাইট ভেঙে গেছে। তিনি তার আত্মীয় ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠিত দৈনিকে কর্মরত এক সাংবাদিককে ঘটনাটি জানালেন। ওই প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক কৌশলে টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাসায় ডেকে আনেন আন্ডারগ্রাউন্ড মালিক-সম্পাদককে। আলাপের এক ফাঁকে একবার তিনি ফোন করেন মোহাম্মদপুর থানায়। থানা থেকে প্রথমে বলা হয়, বিশিষ্ট সাংবাদিকের কেস, সেভাবেই দেখতে হবে, কিছু তো করার নেই। উনি যেভাবে বলেন, কাজ করেন। এরপর ওই প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক নিজের পরিচয় দেন। তখন বদলে যায় থানার সুর। থানার কর্তব্যরত কর্মকর্তা বলেন, তিনি সিরিয়াসলি খেয়াল রাখবেন যেন তার আত্মীয়ের কোনো সমস্যা না হয়। এরপর এসে জেরা শুরু করেন ওই মালিক-সম্পাদককে। প্রথমে গলা চড়িয়ে হুমকি-ধামকি দিলেও পরে পরিস্থিতি কিছুটা আঁচ করে দ্রুত চলে যান ওই মালিক-সম্পাদক। পরিচিত এই সাংবাদিক পরে এ বিষয় নিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন আরো কিছু চমকপ্রদ তথ্য। আলাপকালে তিনি জানান, সরেজমিন অনুসন্ধান করে জানতে পারেন, প্রত্যেক থানার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক এই আন্ডারগ্রাউন্ড কারবারীদের। এদেরকে মূলত, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিভিন্ন মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা ব্যবহার করে মাধ্যম হিসেবে। বিভিন্ন মামলার বাদী-বিবাদী উভয়ের কাছে পুলিশ কর্মকর্তারা পাঠিয়ে দেন আন্ডারগ্রাউন্ড পরিচয়ধারীদের। এরপর এরা সুযোগ বুঝে দরদাম করে মামলার সম্পর্কিতদের সঙ্গে। যা হাতিয়ে নেয় তা প্রথমে তারা পৌঁছে দেয় পুলিশের পকেটে। পরে সেখান থেকে তারা ভাগ পায়। রমনা, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, মতিঝিলসহ রাজধানীর কয়েকটি থানায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এই আন্ডারগ্রাউন্ড কারবারীদের আড্ডা। থানা সংশ্লিষ্টরা জানান, এরা দিনে-রাতে প্রায় সব সময়ই থানায় বসে থাকে। উদ্দেশ্য নতুন কোন মামলা হচ্ছে, নতুন কোন ধান্দা করা যায়। ডিএফপি সূত্র জানায়, সব থানায় সব আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার প্রতিনিধিদের পাওয়া যায় না। এরা নিজেদের মধ্যে শিডিউল করে নিয়ে পালাক্রমে থানায় অবস্থান করে। দেখা যায়, প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সাংবাদিকরা থানায় এসে প্রয়োজনীয় তথ্য না পেলেও, কর্মকর্তারা তাদের সময় না দিলেও বেশির ভাগ সময় খোশ গল্পে মেতে থাকেন আন্ডারগ্রাউন্ডওয়ালাদের সঙ্গে। সূত্র আরো জানায়, আন্ডারগ্রাউন্ডওয়ালাদের তৎপরতা আছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, সচিবালয় প্রভৃতি এলাকাতেও। তারা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্ক রেখে দুই নম্বর পথে টু পাইস কামিয়ে যাচ্ছে।

**উপেক্ষিত নীতিমালা**

তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন নীতিমালায় বলা হয়েছে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যা কমপক্ষে ৬ হাজার, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিকের ক্ষেত্রে ৪ হাজার এবং খুলনা, রাজশাহী ও অন্যান্য স্থানের দৈনিকের কমপক্ষে প্রচার সংখ্যা ৩ হাজার হলে সরকারি তালিকাভুক্ত করা যাবে। অর্ধ-সাপ্তাহিক ও সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যা যথাক্রমে তিন হাজার, দুই হাজার এবং অন্যান্য স্থানের ১ হাজার প্রচার সংখ্যা হতে হবে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকার ক্ষেত্রে দেশের যে কোনো স্থানের জন্য কমপক্ষে ১ হাজার প্রচার সংখ্যা হতে হবে। এর পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠতা, উন্নয়ন কার্যক্রমে সমর্থন দান এবং ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়নের শর্তও দেয়া আছে নীতিমালায়। কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড দৈনিক, সাপ্তাহিক কোনোটিরই প্রচার সংখ্যা একশ'র বেশি নয়, অন্যান্য শর্ত পূরণের প্রশ্নই আসে না। তারপরও এরা সরকারি বিজ্ঞাপনের জন্য তালিকাভুক্ত। কিভাবে তালিকায় আসে তা সবাই জানে। ডিএফপি'র মহা দু'নম্বর কর্মকর্তারা এদের তালিকাভুক্ত করে দু'নম্বরি কায়দায়।

**সব সম্ভবের দেশ**

সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ। এভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার অস্তিত্ব হয়ত অন্য কোনো দেশে পাওয়া যাবে না। সরকারি অর্থের এত অপচয়ও হয়ত কোথাও এভাবে হয় না। নিজেদের আর্থিক লাভের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ ডিএফপি'র সরকারি বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিরা এভাবে সরকারি অর্থের অপচয় করে আসছে, ভবিষ্যতেও করে যাবে, কেউ দেখবে না। বহুবার প্রস্তাব উঠেছে ডিএফপি তুলে দিয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞাপন দেয়ার অধিকার দেয়ার জন্য। ডিএফপি'র মত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কি আদৌ আছে? প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোকে বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণের মানসিকতার উর্ধ্বে উঠে এ বিষয়টি ভাবতে হবে সংশ্লিষ্টদের। ডিএফপি থাকলে আন্ডারগ্রাউন্ড দু'নম্বরি বন্ধ হবে না কখনও। আর এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার জন্য সুস্থ সাংবাদিকতার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, সাংবাদিকতা পেশার সুনামও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সাংবাদিকদেরও এগিয়ে আসতে হবে আন্ডারগ্রাউন্ড মিডিয়া সাম্রাজ্যের অপতৎপরতা বন্ধের জন্য।